The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 67-81, ISSN 2306-3920

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন : ছাত্রলীগের রাজনীতিতে নারীশিক্ষার্থী ১৯৬৬-১৯৭০

হোসনে আরা*

[**সার-সংক্ষেপ:** পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শাসিত এবং শোষিত পূর্ব-পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নেপথ্যে তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ।

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং শিক্ষার্থীদের অবদান অঙ্গাগিভাবে জড়িত–বলতে দ্বিধা নাই, একটি অন্যটির পরিপূরক। শিক্ষার্থী একটি ব্যাপক ধারণারই সাক্ষ্য দেয়, সেক্ষেত্রে নারীশিক্ষার্থীগণ তাদের কর্মগুণে অবস্থান ও পরিপ্রেক্ষিত বিচারে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন ও ৬-দফা প্রণয়ন মাইলফলক হিসাবে স্বীকৃত। স্বাধিকার আদায়ের সেই উত্তাল-উদ্দাম-সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে নারীশিক্ষার্থীদের অবদান তুলে ধরার জন্যই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশিত বইপত্র, পত্রপত্রিকা এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সম্পন্নকৃত এই আলোচনায় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে নারী-শিক্ষার্থীদের অনালোকিত, অনালোচিত এবং উপেক্ষিত অনেক তথ্য তথা অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কর্ম থেকে পাঠক-সমালোচক-গবেষগণ সামান্য হলেও উপকৃত হবেন বলেই মনে করি।]

বাঙালি মুসলমান সমাজ শত শত বছরের অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সুখী-সমৃদ্ধ জীবন-যাপনের আশায় পাকিস্তান রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর-পরই তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উল্টো প্রতিফলন দেখতে পান—প্রথমে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আক্রোশী আঘাতের ক্রিয়ায় এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের নির্লজ্জ ক্রুরতায়। এই নয়া-উপনিবেশবাদী পরিমণ্ডল থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে বাঙালি জাতি জাগ্রত হয়। আর এই জাগরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের পটভূমি তৈরিতে ছাত্রলীগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, কর্মপন্থা, দূরদর্শী চিন্তার আলোকে জেগে ওঠে বাংলার মানুষ—ছাত্রছাত্রীসহ উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন। সম্মিলিত আন্দোলন কতগুলো ধারণা কিংবা মুক্তিপ্রয়াসী মতবাদের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে থাকে। স্বায়ত্তশাসন সেই মতবাদগুলোরই অন্যতম। প্রাসঙ্গিকতা বিচারে বলা যায় যে, স্বায়ত্তশাসন একটি ধারণা—যা কোনো বহিরাগত শক্তি, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র কিংবা

* **হোসনে আরা :** সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিপার্শ্ব-শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন এবং প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পাদনপূর্বক জীবনযাপন ও উন্নয়নের ধাপগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করে অগ্রসর হতে পারে। স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্ব-নিয়ন্ত্রণ, অধিকারসহ সর্বমানবীয় সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ জড়িত। প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। জাতিরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-শাসন বা স্বায়ত্তশাসনকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। বৃহৎ অর্থে স্বায়ত্তশাসন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িত—যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট জনসংখ্যা, একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী, সুনির্দিষ্ট ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিদ্যমান। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন কিংবা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত থাকে গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী সরকারের বীজ। মহাত্মা গান্ধীর 'স্বরাজ', হেনরি ডেভিড থরোর 'স্ব-শাসন', বঙ্গবন্ধুর ৬দফার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত।

স্বাধীনতাকামী মানুষের সেই উত্তাল সংগ্রামমুখরতা কতগুলো ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সেই তরঙ্গাভিঘাতের অন্যতম দিক। সেই দিক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্ররাজনীতি সারা দুনিয়ায় সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। যুগে-যুগে, কালে-কালে, দেশ থেকে দেশান্তরে সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, রাজনীতিক, কবি, লেখক, সমালোচকদের আলোচনা-সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, গ্রিস থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকা হয়ে এশিয়ার সমগ্র ভূ-ভাগে সমাজ বদলের হাতিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্রদের ব্যাপক ও বহুল প্রাণশক্তি। পৃথিবীর সমাজবিন্যাসে ও আশাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ছাত্রদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ছাত্রদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ যুগে-যুগে, কালে-কালে উজ্জীবিত হয়েছে—দেশগঠন ও সমাজ-বদলে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নেপথ্যেও ছাত্রদের ভূমিকা অগ্রগণ্য:

> ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানে সকল রকম রাজনীতিক কার্যকলাপ কঠোর সামরিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ থাকাকালে এদেশের ছাত্র সমাজই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্ম-অনুষ্ঠান সংঘটিত করেছে। এসময় সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক চেতনার এক সুস্থ পরিমণ্ডল তারাই গড়ে তুলেছে তৎকালীন পূর্ব বাঙলায়। [...]
>
> জেনারেল আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ তোলা এবং আন্দোলনে নামার কাজ ছাত্রদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। ১৯৬২ সালে সংবিধানের গণতন্ত্রায়ণ প্রয়াস ইত্যাদিতেও ছাত্রদের ভূমিকা ছিল। ১৯৬৪ সালে এদেশে ছিল প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার। ১৯৬৬ সালের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা অন্যতম ছিল। ১৯৬৮-৬৯ এর আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটায় ছাত্ররা এবং এর নেতৃত্বেও ছিল তারা। ছাত্রদের ১১ দফা সেসময় আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। গণ-অভ্যুত্থানের যেটুকু সফলতা এসেছে, স্বৈরাচারী আইয়ুবের বাস্তিল দুর্গের যে পতন ঘটেছে, তার মূলে নিহিত ছিল প্রধানতঃ ছাত্রদের প্রচেষ্টা। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসের একমাত্র সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার বিপুল বিজয়ের পেছনেও ছাত্রদের অবদান অসামান্য। নির্বাচনের পর পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর টালবাহানা, চক্রান্ত ও নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে দেবার অপচেষ্টা সম্পর্কে ছাত্ররাই আগে-ভাগে ব্যাপক জনগণকে সচেতন করে দেয় এবং সত্যি সত্যিই যখন নির্বাচনের রায়কে বাতিল করার ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে লাগলো, তখন তারাই 'পাকিস্তানের মুখে পদাঘাত' করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলে। (হাসান উজ্জামান, ১৯৮৪ : ১৩-১৪)

বাঙালির সংগ্রামমুখর সেই সমস্ত উত্তাল দিনগুলোর নেপথ্যকাহিনী বিশ্লেষণে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান আমাদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংঘটিত আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ইতিহাসের বিস্মৃতির অন্তরালে থেকে যায়। ছাত্রীদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের সেই বিস্মৃত অতীতকে অদৃশ্য অবস্থান থেকে উদ্ধার করে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এ কাজটি করলেই আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও অবদান মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হবে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রলীগের নারীকর্মীদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের ইতিহাস রচনা করা নয়, বরং তাদের সামগ্রিক অবদান কিভাবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে তা নির্ণয় করাও।

দেশভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী। এ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রলীগের রাজনীতিতে ছাত্রীদের ভূমিকা কী ছিল এর আলাদা উল্লেখ নেই। সেই প্রেক্ষাপটে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে নারীশিক্ষার্থীদের ভূমিকা তুলে ধরার নিমিত্তে বর্তমান গবেষণার অবতারণা। কিন্তু বাস্তবে গবেষণার ক্ষেত্রে ১৯৪৮-১৯৬২ পর্যন্ত সময়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে ছাত্রলীগের নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। যদিও ছাত্রীরা প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তথাপিও ছাত্রলীগের পুরুষ নেতৃত্বের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে যে সকল বক্তৃতা বিবৃতির তথ্য পাওয়া যায় সেখানে ছাত্রদের নাম পাওয়া যায়। ছাত্রলীগের নারী নেতৃত্বের কোন উল্লেখ সেখানে নেই।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষার প্রশ্নে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা করে। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অবদান উল্লেখ করার মতো। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন, দেয়াল ও পোস্টার লিখন, বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে গিয়ে বাংলা ভাষার আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্রীদের উজ্জীবিত করণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছাত্রীরা ভূমিকা পালন করেছেন। সামগ্রিক বিচারে পুরোদেশেই ছাত্রী সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সারা দেশে ভাষা আন্দোলনের জন্য ছাত্রীরা উদ্বুদ্ধ হয়।

দেশভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলায় যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে সে সকল আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। তারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদান করা, মিছিল করা, সামনে থেকে নেতত্ব দেওয়া—এ ধরনের সকল কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছিল। ছাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে উজ্জীবিত হয়েছিল তৎকালীন ছাত্রসমাজও। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করাটা খুব সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। এ প্রসঙ্গে যুক্তবাংলা পরিকল্পনার পক্ষে কাজ করতে গিয়ে সেই সময়ের একজন ছাত্রী লুলু বিলকিস "ধর্মীয় কুসংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির নিকটপ্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হতে হতেন তৎকালীন সময়ে। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে নারীদের কথা বলতে হলে পর্দার ভিতর থেকে কথা বলতে হতো। '১৯৪৭ সালে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রচেষ্টার জন্য নেত্রকোনায় একটি সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লুলু বিলকিস বক্তৃতা করতে উঠলে কয়েকজন মৌলভী পর্দা ভঙ্গের আপত্তি তোলেন। তারপর লুলু বিলকিস মঞ্চের পরিবর্তে স্কুল ঘর থেকে বক্তৃতা দিতে চাইলেও পারেননি পর্দা প্রথার জটিলতার কারণে।' (ড. মোহাম্মদ হাননান, ২০১৩ : ৭০)। তৎকালীন পর্দাপ্রথাকেন্দ্রিক স্বীকৃত সমাজ বাস্তবতার মধ্যে নারীদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রওশন আরা বাচ্চুর জবানী থেকে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়:

> স্বাধিকারের প্রশ্নে ভাষার দাবিকে সফল করার জন্য ছাত্রীরা নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীসংখ্যা ৬০/৭০ এর বেশি হবে না। তখনকার সময়ে ছেলেদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা নিষেধ ছিল। প্রক্টরের মাধ্যমে কথা বলতে হতো। নতুবা দশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার সময় ছাত্রীদের কমন রুম থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ছাত্রীরা মাথায় কাপড় দিয়ে, অনেকে বোরখা পরে ক্লাস করত। ক্লাসে মেয়েরা শিক্ষকের সামনের সারিতে বসত। কিন্তু সেদিন ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ২১ শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সামাজিক বাধাবিপত্তি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করবেন, হল থেকে নাম কেটে দিয়ে বের করে দেবেন অথবা অভিভাবকগণ পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন—এ ধরনের সবকিছু অগ্রাহ্য করে সংগ্রামী ভাইদের সঙ্গে সমভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। (বাশার খান সম্পাদিত ২০১৮ : ২১)।

লক্ষ্যণীয় যে, শুধু পর্দা প্রথার কারণে নারীরা পিছিয়ে ছিলেন তাই নয়, বরং সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও ছাত্রীদের কঠোর বিধিনিষিধের মধ্য দিয়ে চলতে হতো। এতসব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ভাষা আন্দোলনে নারীর যে অংশগ্রহণ তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন : আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ-পীড়নে নির্যাতিত পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মুক্তির প্রয়াসে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়ে পূর্ব-বাংলার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ছয়দফাভিত্তিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতোপূর্বে লাহোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোয় এক কনভেনশনে ছয়দফা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য সাবজেক্ট কমিটিতে পেশ করলে কমিটি তা প্রত্যাখ্যান করেন। আয়োজকদের একটি প্রভাবশালী মহল শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য শুনতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি এবং তাঁর সফর সঙ্গীগণ সম্মেলন বর্জন করেন। বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার কাজে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছাত্রলীগের জোরালো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

অনেক স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আচরণে বাঙালির ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই পূর্ব-বাংলায় ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। এর নেতৃত্ব প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। মুলত, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের মূল কাণ্ডারির দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পূর্বে ধর্মের ভিত্তিতে যে অখন্ড পাকিস্তানের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা এসময়ে এসে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে পরিণত হয়। এমনকি স্বায়ত্তশাসন না-পেলে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করা যায় কি-না তারও চিন্তা করতে শুরু করেন। (গোলাম মুরশিদ : ২০১০)। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে লাহোরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় তিনি ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ দফা বাস্তবায়নকল্পে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলেন ছাত্রলীগের উপর। ১৯৬৬ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি করাচী থেকে ফিরে এসে ঐদিনই ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর বাসভবনে বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উপর ৬-দফা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ

করে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতাদের অধিকাংশই মুসলীম লীগ থেকে এসেছে—হতাশ হয়ে, সুযোগ সুবিধা না পেয়ে। তাদের দিয়ে ৬ দফার আদর্শ বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাই জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখল করার জন্য ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের নির্দেশ দেন এবং ৬ দফার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন।' (ড. মোহাম্মদ হাননান, ২০১৩ : ৩০৯)। মূলত, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের ভার শেখ মুজিবকে প্রায় একাই বয়ে বেড়াতে হয়েছে। দলের বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ নেতার সংখ্যা কম ছিল। ফলে ঐ সময়ে শেখ মুজিবের প্রধান অবলম্বন ছিল ছাত্রলীগের তরুণ নেতা-কর্মীরা। (মহিউদ্দিন আহমদ, ২০১৬, পৃ. ১৩১)।

৬ দফা আন্দোলন ও ছাত্রলীগের নারীশিক্ষার্থী

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ৬-দফা হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ। তার ছয়টি দাবির প্রথম দফা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র গঠন। রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায়নের ব্যাপারটি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য দেন। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিন্যাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র। আর্থিক ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো প্রদেশগুলোর স্বতন্ত্র মুদ্রা থাকবে। দেশ গঠনে কর আদায় মূল্যবান ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে বিরোধ অবসানের লক্ষে বলেন, কর আরোপ এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো দেশের দুই অংশে বৈদেশিক আয়ের দুটি আলাদা হিসাব থাকবে। সর্বশেষ বলা হয়,পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব আধাসামরিক বাহিনী থাকবে ।

এই সকল দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান খুবই বিচলিত হন এবং ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার করতে থাকেন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ফলে আন্দোলন স্তিমিত হবার পরিবর্তে ধীরে ধীরে আরো বেগবান হতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন কারাগারে অন্তরীণ নেতাদের মুক্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্ততঃ ১০ জন নিহত হন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১ জন মারা যান। ৭ই জুনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ নেতাই গ্রেফতার হন। ফলে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বর্তায় আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমের উপর। এসময় আমেনা বেগম কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ৬ দফাকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে সমর্থ হন। তাঁর নেতৃত্বেই চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আওয়ামী লীগের পাতাকা সমুন্নত থাকে। (অলি আহাদ, ২০১২ : ৩১০)।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের এই সংকটকালে বেগম মুজিব নেপথ্যে থেকে আওয়ামী লীগের কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও বেগম মুজিবের সংগে যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত তাদের আন্দোলনের অগ্রগতি জানাতেন এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা শুনতেন। তার নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণায় আমেনা বেগম ছয় দফার পক্ষে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি আমেনা বেগমকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'সেক্রেটারীতো কেউ নেই, আপনিই সেক্রেটারী'—বেগম ফজিলাতুননেসার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমেনা বেগম ছয় দফার পক্ষে জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হন। আমেনা বেগম পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করেন। তিনি কুমিল্লায় গিয়ে ছাত্রীদেরকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বেগম মুজিবকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের সকল নেতা যখন জেলে তখন ছাত্রীদেরও কিছু করার আছে এদেশের জন্য।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক মমতাজ বেগম : ২০১৮)।

কুমিল্লায় তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন কুমিল্লা মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের প্রথম সহ-সভানেত্রী এবং কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মমতাজ বেগম। কুমিল্লা মহিলা কলেজের সাধারণ সম্পাদক জোবেদা খাতুন পারুল, রাশু প্রমুখ। একই সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা আব্দুর রাজ্জাক এবং রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বাকীসহ ছাত্রনেতারা কুমিল্লায় আসেন ৬-দফার পক্ষে জনমত গঠন করার লক্ষ্যে। তাঁরা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভিপি আফজাল খান, মমতাজ বেগম, মফিজুর রহমান বাবুল, সৈয়দ রেজাউর রহমানসহ কুমিল্লার ছাত্রনেতৃবৃন্দকে বলেন, ৬-দফা বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেছেন, অতএব আমাদের সবাইকে এর পক্ষে কাজ করতে হবে। (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক মমতাজ বেগম : ২০১৮)। ছাত্রনেতাদের নির্দেশ মোতাবেক মমতাজ বেগম তার সহকর্মীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের কাছে যান এবং ৬-দফার আন্দোলনে তাদের সম্পৃক্ত করেন। এসময় তারা কুমিল্লায় ৬-দফার সমর্থনে একটি মিছিলের আয়োজন করেন। যে মিছিলের প্রথমে ছিল মেয়েরা এবং তাদের পেছনে ছিল ছেলেরা। ছয় দফা আন্দোলনের যে ছবিটি সব বইয়ে দেখা যায় সেই ছবিটি এই মিছিলের। মমতাজ বেগমকে এই মিছিলের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের সময় পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম মনু স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। এ সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁর বড় ভাইকে গ্রেফতার করা হলে তিনি এবং তার বোন স্কুলের মেয়েদের সংগঠিত করেন এবং ভাইয়ের মুক্তি ও ছয় দফার পক্ষে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। এসময় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাদের আহ্বানে এলাকার জনগণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ৬-দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। (শাহনাজ পারভিন, ২০০৭, : ২৬৭)। দেশব্যাপী ৬-দফার বীজমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে তারই প্রয়াস দেখা যায় নোয়াখালীতে—ফরিদা খানম সাকী নোয়াখালীতে ছয় দফার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। ছাত্রলীগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ ছিল পারিবারিক। তাঁর নানা নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন বিধায় তাদের বাসায় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের যাতায়াত ছিল। ছাত্রনেতাদের মুখে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের বিভিন্ন বৈষম্যের বিষয়ে আলোচনা শুনে তাঁর ছাত্রলীগের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ফলে তিনি চিন্তা করেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করতে পারেন কি-না? কোন কিছু করার প্রতি তার যে আগ্রহ সেই আগ্রহ থেকেই তিনি ছাত্রলীগের বিভিন্ন মিছিল মিটিংএ অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। শুধু নোয়াখালীতে নয়, তিনি ছাত্রলীগের বিভিন্ন সম্মেলন, কর্মীসভা, উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং, ডাকসুর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী, : ২০১৮)।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ছাত্রলীগে নারী কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নারী শিক্ষার্থীরা এ সময়ে ৬-দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। অকুতোভয় নারী শিক্ষার্থী অধিকার আদায়ের এ সংগ্রামে নির্ভয়ে অংশ নেন। সরকার বিরোধী বক্তব্য দেওয়ার খেসারত হিসেবে ছাত্রলীগের নারীনেত্রী লুৎফন নেসাকে জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। (অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, ২০১৮, : ১১৮)। পরে তিনি ইডেন কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। লুৎফন নেসার বাবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ায় ছোট বেলা থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ঢাকা গভঃ গালর্স কলেজ (প্রাক্তন ইডেন কলেজ) বখ্শী বাজার ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এভাবে ছাত্রীদের ভয়-ভীতি দেখাবার চেষ্টা করলেও তারা অদম্যই থেকেছেন। গণজাগরণের সেই উত্তাল সময়ে স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই আন্দোলন বেগবান হয়। এসময়ে কলেজের ছেলেরা এসে স্কুলের ঘন্টা পিটিয়ে দিত ছাত্রীদের মিছিলে

নিয়ে আসার জন্য। ছাত্রীরা বুঝে না বুঝে তীব্র আবেগ নিয়ে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী,: ২০১৮)। মূলত পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন রকম বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এদেশের আপামর জনসাধারণের সাথে সাথে এই অঞ্চলের নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বঞ্চনার বোধ জাগ্রত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ফরিদা খানম সাকীর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে প্রতিটা ক্ষেত্রে তখন বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কেউ ভালো চাকুরী পেত না। সেনাবাহিনীতে মেজরের উপরের পদে চাকুরীরত অফিসারের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। এ অঞ্চলের ছেলেরা ভালো চাকুরীতে যোগ দিতে পারেনি, বিদেশ যেতে পারেনি, এখানকার পাট চলে যাচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অপরদিকে এখানকার কাঁচামাল সস্তা দামে কিনে আমাদের এখানে চড়া দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করেছে। ফলে এই শোষণ এবং বঞ্চনার অবসানের উদ্দেশ্যে আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী,: ২০১৮)।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ছাত্রলীগের নারীশিক্ষার্থী

ছয় দফা আন্দোলন অব্যাহত থাকায় পাকিস্তান সরকার বিচলিত হয়ে পড়েন। তারা অনুধাবন করতে থাকেন যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঙালিরা সন্তুষ্ট হবেন না। বাঙালিদের এই আন্দোলন নস্যাৎ করার লক্ষ্যে চরম দমন-পীড়ন শুরু করেন। এরই একটি পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। মামলাটির রাষ্ট্রীয় নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্রে মামলাটির শিরোনাম বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করা হয়। (কর্ণেল শওকত আলী, ভূমিকা)। এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দি, সাক্ষীদের জেরা, কৌসুলি অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের মধ্যে সওয়াল-জবাব, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর নির্যাতনের বিবরণ ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় বিস্তারিত ছাপা হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে জনমত সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন বাড়তে থাকে। (মহিউদ্দিন আহমদ, ২০১৬, : ১৭৯)। এই মামলার বিচার চলাকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ ট্রাইবুনালে লিখিত জবানবন্দি পাঠ করেন, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল—দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—ছয়দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়। (মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), ১৯৯৯, : ২৩৯)।

এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পূর্ব বাংলায় প্রবল গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। এই গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন এবং অর্থ-সরবরাহসহ

প্রযোজনীয় সহযোগিতা করতেন। ছাত্রীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম বলেন, 'একদিন তিনি শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় আসলেন আমাদেরকে নির্দেশনা দেবার জন্য। বোরখা পরে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু যাওয়ার সময় শাড়ী এবং স্যান্ডেল পাল্টে বোরখা পরে ফেরত যান।' (সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মমতাজ বেগম)। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের এভাবেই তিনি ফাঁকি দিয়ে গণ-আন্দোলন সংগঠনের কাজ করতেন। এ প্রসঙ্গে ফরিদা খানম সাকীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতারাতো বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিবের নির্দেশে চলতেন। অপরদিকে আমাদেরকে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ যেভাবে বলতেন আমরা সেভাবে কাজ করতাম।' (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)। ছাত্রলীগের নারীশিক্ষার্থীদের এ সমস্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় জি ডব্লিউ চৌধুরীর লেখনীতে। বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'মুজিবের স্ত্রী একজন অশিক্ষিত মহিলা হলেও ৬৬ সালে মুজিব বন্দি হওয়ার পর থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেন'। (জি ডব্লিউ চৌধুরী, অনুবাদঃ ইফতেখার আমিন, ২০০৫, : ৩২)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে তুলনীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞান আলোচনায় বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিবের সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে আসে মওদুদ আহমদের বক্তব্যে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানালে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তির জন্য প্রভাবিত করেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে ফলপ্রসূ হয়। (মওদুদ আহমদ, ১৯৯২, : ১১৯)।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে। এই আন্দোলনে ছাত্রলীগের নারী সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে ২১ জানুয়ারি বিশাল ছাত্রী মিছিল হয়। সেই মিছিলে ছাত্রলীগের নারী সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। (সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মমতাজ বেগম)।

এ সময়ে ছাত্রলীগের যে সকল নারী সদস্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মমতাজ বেগম, জোবেদা খাতুন পারুল, ফরিদা খানম সাকী, রাফিয়া আক্তার ডলি, ফোরকান বেগম, নিলুফা পান্না, টুনটুনি, জেসমিন। (সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মমতাজ বেগম)। এছাড়াও ফরিদা খানম সাকী অন্যান্য যে সকল ছাত্রলীগ নেত্রীর কথা বলেছেন তারা হলেন, লাভলী, পারুল, নাঈমা, হাসি, ছোট ডলি (ইকবাল সোবহান চৌধুরীর বোন), মরিয়ম প্রমুখ। (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের একজন অগ্রবর্তী সেনানী অধ্যাপক মমতাজ বেগম। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি রোকেয়া হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়েই তিনি রোকেয়া হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অতঃপর ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সকল দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে তিনি ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন। (সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মমতাজ বেগম)।

বঙ্গবন্ধুর তনয়া শেখ হাসিনা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের নারীদের আন্দোলন সংগ্রামে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রচুর সময় দিয়েছেন। সেই উত্তাল সময়ে শেখ হাসিনার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধ্যাপক মমতাজ বেগম বলেন, 'আন্দোলনের মধ্যে একদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস মেরে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়ে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছিলো। আমি আর নেত্রী (শেখ হাসিনা) বাংলা বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে

ছিলাম। এমন সময় দেখি রব ভাই (আ স ম আব্দুর রব) টিয়ার শেলের আঘাতে আহত হয়ে পড়ে আছেন। আমি আর নেত্রী দুজন মিলে ছাত্রদের সহযোগিতায় রব ভাইকে আমাদের কমনরুমে নিয়ে আসি। বাথরুম থেকে মগ দিয়ে পানি দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলি। এভাবে ছাত্রলীগের সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন সংগ্রামে শেখ হাসিনার অংশগ্রহণ তৎকালীন ছাত্রী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তারা আরো বেশি করে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হন।' (সাক্ষাৎকার : অধ্যাপক মমতাজ বেগম)। এছাড়াও শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিতেন। এভাবেই তিনি গণ-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এছাড়া জেলখানায় পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে তার পরামর্শ ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দিতেন।

গণ-আন্দোলনের আরেক সূর্য-সৈনিক ফরিদা খানম সাকী। এই আন্দোলনের প্রতিটা পদক্ষেপে তিনি সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ছাত্রলীগ নেত্রী মমতাজ বেগম, আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে আন্দোলনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। এভাবেই ফরিদা খানম সাকীসহ তাঁর সহযোদ্ধারা সক্রিয় ছিলেন। ফরিদা খানম সাকী ঐ সময়ের আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। যে কোন মিছিল মিটিংয়ে তাদেরকে আহ্বান করা মাত্র তারা কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই অংশ নিত। আমাদের সাথে যে সকল ছাত্রীদের সংযোগ ছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল হল কেন্দ্রিক। ফলে হলের পরিবেশটাই মেয়েদের কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।' (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)। এ সময়ে তারা রোকেয়া হলের বারান্দায় বসে পোস্টার ও ফেস্টুন বানানোর কাজ করতেন। রুমে রুমে গিয়ে পরবর্তী দিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতেন। মাঝে মাঝে ফরিদা খানম সাকী তার সহযোদ্ধা মমতাজ বেগমের সাথে মিলে সন্ধ্যার পরও কাজ করতেন। এভাবেই ১৯৬৯-এ গণ-আন্দোলনে ছাত্রলীগের নারী নেতৃত্ব নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন।

১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের সময় সকল মিটিং মিছিলের সম্মুখভাগের কর্মী ছিলেন কাজী রোজী। তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বখ্‌শীবাজার গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়তেন। এসময় ছাত্রলীগের সংগঠক হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে মেয়েদের সংগঠিত করা, রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা, দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার কাজ করেন। (অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, : ১২২)। ছাত্রলীগের আরেকজন সক্রিয় নারীকর্মী বেগম শামসুন নাহার। তিনি কলেজে পড়াকালীন সময় থেকেই ছাত্রলীগের বিভিন্ন মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাকালীন তিনি মিছিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা ছাড়াও ফজলুল হক মণি পরিচালিত রাজনৈতিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের সময়ে তিনি সূত্রাপুর এলাকার মহিলাদের কাছে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন। (অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, : ১৬৮)। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের আরেকজন অকুতোভয় ছাত্রলীগ নেত্রী ফরিদা আক্তার। স্কুল জীবনে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে নারায়ণগঞ্জ গালর্স স্কুলের ছাত্রলীগের ছাত্রী কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি মহিলা কলেজের সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। অদম্য এই নারী ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে নারায়ণগঞ্জের মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে খোলা জীপে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে শহরময় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। (অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, : ১৩২)।

রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান রওশন জাহান সাথী। বাড়িতে রাজনৈতিক আবহে তার বেড়ে ওঠা। ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী রওশন জাহান সাথী ১৯৬৮ সালে যশোর মহকুমা ছাত্রলীগের

সভাপতি হিসেবে আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বৃহত্তর যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিসেবে সামনের কাতারে থেকে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে রওশন জাহান সাথী বলেন, 'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আমার রাজনৈতিক জীবনের একটি মোড় যেখানে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সে সময়ে যশোরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের কনভিন্স করেছি। আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি, লিফলেট বিলি করেছি। এভাবে বিভিন্ন স্কুল কলেজের মেয়েদের সাথে নিয়ে আমরা মিছিল, মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছি।' রওশন জাহান সাথীর সাথে তৎকালীন সময়ে আরো যেসব ছাত্রীরা গণ-আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন—ফিরোজা, বিথী, আলেয়া, হিয়া প্রমুখ। আরো অনেক নারী শিক্ষার্থী ছিল যারা ছাত্রলীগ করতেন কিন্তু তাদের নাম তিনি মনে করতে পারেননি। সময়ের পরিক্রমায় তাদের নাম মুছে গেছে। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় এই মেয়েদের অনেকেই সন্ধ্যার পরও রওশন জাহান সাথীদের বাসায় বসে পোস্টার লেখার কাজ করতেন। (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)।

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হতে দেখেন; মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত হবার প্রেরণা লাভ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের, ছাত্র-জনতার, কৃষক-শ্রমিকের বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হন। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত এদেশের ছাত্রীরা আরো বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নেবার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এদেশের ছাত্রী সমাজ বিশেষতঃ ছাত্রলীগের নারী শিক্ষার্থীরা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন ।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ছাত্রলীগের নারীশিক্ষার্থী

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন ঘটলেও আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর পর তিনি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন দিলেন । ৭ই ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে '৭০ সালের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়, নির্বাচনকালীন সময় এবং অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সময়কালকে বিশাল পরিবর্তনপূর্ব যুগসন্ধিক্ষণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই সময়কালে ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে মাঠেই ছিল। তাঁরা আসলে স্বাধীনতার স্বপ্নের কাজ ধারণ করে পথ চলছিল। ছাত্রদের সেই পথ চলার সঙ্গী ছিল তাদের অকুতোভয় নারী সহকর্মীরা। যারা সকল সময়ে মিছিল মিটিং এর সর্বাগ্রে অবস্থান করে স্বাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। এই সময়কালের অবস্থা সম্পর্কে রওশন জাহান সাথী বলেন, 'সমগ্র '৭০ সাল জুড়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একসঙ্গে কাজ করেছে। এখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ছিল সর্বাগ্রে। আমরা প্রতিটা স্কুল, কলেজে যেতাম এবং মেয়েদেরকে সংগঠিত করে মিছিল মিটিংয়ে নিয়ে আসতাম। মেয়েরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসত। পরিবেশটাই এরকম ছিল। চারিদিকে একটা জাগরণ তৈরী হয়েছিল।' (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। সে সময়ে এ সকল ছাত্রীরা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তারা কীভাবে শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নিষ্পেষিত ছিলেন। ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে চতুর্থ বিভাগে পাশ করলেও তারা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন। শুধু কলেজে নয়, তারা ডাক্তারি এবং

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ারও সুযোগ পেতেন। এই নিষ্পেষণটা ছাত্রসমাজ ভাল করে বুঝেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল। (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। এভাবেই বাঙালি ছাত্ররা নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার থেকেছেন। '৭০-এর নির্বাচনে প্রচার চালানোর জন্য ছাত্রীরা গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রচারকার্য চালাতেন। এক্ষেত্রে তাদেরকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে নির্দেশনা দিতেন তারা সেটাই পালন করতেন। এ সময়ের কথা জানা যায় ফরিদা খানম সাকীর জবানীতে। তিনি বলেন, 'আমাদের গ্রুপে গ্রুপে পাঠাতো। নূরে আলম সিদ্দিক আমাদের দু'টাকা, তিন টাকা দিতেন আর বলতেন-ছোট মিনি বিস্কুট কিনে খেও। কোন পরিচিত ছাত্রলীগের ছেলে মেয়ে পেলে ওদের বাড়িতে খেও। তবে শেখ কামাল আমাদের গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিত আর বলত, আপা আপনারা এভাবে যাবেন আমি গাড়ি যোগাড় করে দিচ্ছি। শেখ কামাল আমাদেরকে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করত। ফলে আমরা নিশ্চিন্তে রাত হোক দিন হোক কাজ করতাম।' (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)। তিনি আরও বলেন, 'আমরা অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্মস কালেকশন করেছি। অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমাদেরকে আর্মস ট্রেনিং দিত। প্রথমে ১০/১৫ জন মেয়ে ছিলাম পরবর্তীতে ১৫০ জন মেয়ে হয়েছে। জিমনেসিয়ামে এই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ট্রেনিং হয়েছে।রিটয়ার্ড আর্মি অফিসার দুলু এবং খসরু আমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা ছিল না, বিভিন্ন কলেজের মেয়েরাও ছিল আমাদের সাথে। সিদ্ধেশ্বরী, ইডেন, বদরুন্নেসা কলেজের মেয়েরাই বেশি আসত।' (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে এদেশের ছাত্রীরা অসীম সাহস এবং বীরত্বের সাথে সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে পথ চলেছেন। কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদের সে অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে পারে নাই।

বৈরী-সময়ে রাজনৈতিক সচেতনতায় পারিবারিক আবহ

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ছাত্রলীগের নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সেই উত্তাল আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নারীদের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত। ছাত্রলীগের নারী নেতৃত্বের অধিকাংশই পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাদের অধিকাংশের পিতা, পিতামহ, চাচা অর্থাৎ নিকটাত্মীয়রা শিক্ষিত ছিলেন। ফলে পারিবারিক বাধা না থাকায় তাদের পক্ষে ছাত্ররাজনীতিতে যোগদান করা সহজতর হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রওশন জাহান সাথীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পারিবারিক অবস্থান এবং কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবারে ছেলে মেয়েতে কোন ভেদাভেদ ছিল না, বাবা মা আমাদের বলতেন-লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।' (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। রওশন জাহান সাথীর পরিবার উচ্চশিক্ষিত ছিল। তাঁর দাদা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফুফুরা কোলকাতার লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে পড়াশুনা করেছেন।

অতএব তাঁর পারিবারিক অবস্থান তাকে ছাত্ররাজনীতি করতে উৎসাহিত করেছে। পারিবারিক বাধা নিষেধ না থাকার কারণে তিনি কোন কোন সময় সন্ধ্যার পরেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের আরেকজন নেত্রী ছিলেন ফরিদা খানম সাকী। তিনিও রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার নানা নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ছোটবেলা থেকেই তিনি নাচ, গান, আবৃত্তি শিখেছেন স্টেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। ফলে তার পারিবারিক আবহ রাজনৈতিক

আন্দোলনে অংশগ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল। রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং শিক্ষিত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে তিনি নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসে পার্টির কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।

আবার আমরা মমতাজ বেগমের পারিবারিক অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে তিনি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার পিতা-মাতার আকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মত রক্ষণশীল এলাকার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার পরিবার উদার চিন্তা চেতনার অধিকারী ছিল ফলে তাকে প্রথমে কুমিল্লায় এবং তার পরে ঢাকায় লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

অপর একজন ছাত্রীনেত্রী রাফিয়া আখতার ডলি—তিনিও টাঙ্গাইলের প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। এছাড়া ফেরদৌস আরা খানম ডলির পিতাও একজন সরকারী চাকুরীজীবী ছিলেন। ডা. লুৎফন নেসার বাবা ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা, কাজী রোজীর বাবা ছিলেন সাংবাদিক। ফরিদা আক্তার এর বাবা ছিলেন এডভোকেট।

এভাবে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী শিক্ষার্থীদের পারিবারিক অবস্থান দেখে ধারণা করা যায় যে সমাজের অগ্রসর এবং শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা তৎকালীন সময়ে আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তবে সাধারণ শিক্ষার্থী যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তারা অধিকাংশই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আসলে যুগে যুগে সমাজ বদলের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রধান কাণ্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বতঃস্ফূর্ততার কারণ অনুসন্ধান

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে যে সকল নারী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে এসেছিলেন। কোন রকম ভয়-ভীতি, প্রতিবন্ধকতা তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। নারী শিক্ষার্থীদের এই স্বতঃস্ফূর্ততার পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করেছিল—প্রথমত: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত: নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং তৃতীয়ত: ছাত্রদের সহযোগীতামূলক মনোভাব। এই তিনটি কারণে ছাত্রীরা ব্যাপকহারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পেরেছেন।

প্রথমত: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বগুণ এদেশের ছাত্রীদের প্রবলভাবে আলোড়িত করে আকৃষ্ট করে। দেশ-মাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে। অর্থনৈতিক মুক্তি এবং স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুব রহমান বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হবার পূর্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য-সহকর্মী। ফলে সোহরাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের কোন সরাসরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি । সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন একটি মাইলফলক। এর মধ্য দিয়ে তিনি আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্তকারী নেতায় পরিণত হন। দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বগুণই শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের কাণ্ডারীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পূর্ববাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হন। '৬৬ সালের পূর্বে ছাত্রলীগে নারী নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা না গেলেও ৬-দফার সময় থেকে ব্যাপকহারে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে ছাত্রলীগের নেত্রস্থানীয় শিক্ষার্থী রওশন জাহান সাথীর উপলব্ধি ছিল এমন : 'আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু একজন দুরদর্শী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা। যিনি বাঙারি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সমস্ত জাতীয় বিষয়গুলোকে হৃদয়ঙ্গম করে সেভাবে আন্দোলন সংগ্রাম রচনা

করেছেন। তাদের উপর বঙ্গবন্ধুর বিরাট বিশ্বাস ছিল।' (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। আর ছাত্রলীগের এই কাণ্ডারী হওয়ার নেপথ্য কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর সাথে ছাত্রলীগের আত্মিক সম্পর্ক। যে সম্পর্কটা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কটা এই সময়ে এসে আরো দৃঢ় এবং মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এবং ছাত্রলীগের এই যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক একদিনে তৈরী হয়নি। এ প্রসঙ্গে রওশন জাহান সাথী আরো বলেন, 'ছয় দফার আন্দোলন, ছাত্রদের এগার দফার আন্দোলন এবং সর্বোপরি একদফার মুক্তিযুদ্ধ এটা ধারাবাহিকভাবে চলেছে। সুতরাং ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা সেটা একটার সাথে আরেকটা যুক্ত।' (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। সাথী মনে করেন এই ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের কারণে বঙ্গবন্ধুর সাথে ছাত্রলীগের একটা ওয়ার্কিং রিলেশন তৈরি হতে পেরেছিল। বাস্তবিক অর্থে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন জাতীয়তাবাদী নেতার নেতৃত্ব ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অসম্ভব ছিল।

মূল কথা হলো বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মনের সুপ্ত লালিত যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ১৯৬৪ সালে পার্টি পুনরুজ্জীবন ও পরবর্তীতে ছয় দফা প্রনয়ণের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রী সমাজও তাই ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনীতিতে অধিকহারে সক্রিয় হতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত: নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর পরিবারের কারণে তারা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, ছাত্রলীগের কোন পুরুষ সদস্য ছাত্রীদের সাথে অসৌজন্যমূলক কোন আচরণ কখনো করেননি। বরং রাত হয়ে গেলে তাদের বাড়ি পৌছে দিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন। ফলে নারীরা কাজ করার মত উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফরিদা খানম সাকী বলেন, 'সেই সময়ে আমাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা ছিল, রেসপেক্ট ছিল। ছেলেরা মেয়েদের কোন রকম টিজ করত না, হারাসমেন্ট করত না। আমাদের সম্পর্ক ছিল ভাই-বোনের মত। আমরা হল থেকে বের হয়ে কোন জায়গায় যাবো বলে দাঁড়িয়েছি তখন। কোন গাড়ি আসলে বলতো আপা কোন দিকে যাবেন? আমাদের কোন সহযোগীতা লাগবে?' (সাক্ষাৎকার : ফরিদা খানম সাকী)। এভাবে ছাত্ররা ছাত্রীদেরকে প্রতিটা ক্ষেত্রে সম্মান এবং সহযোগীর দৃষ্টি নিয়ে দেখতো বলে মেয়েরা রাজনীতি করতে উৎসাহিত হতেন। এ প্রসঙ্গে রওশন জাহান সাথীও একই ধরনের কথা বলেছেন। তৎকালীন সময়ে ছাত্রনেতৃবৃন্দের এই সহযোগীতামূলক মনোভাব একটা সুস্থ কর্মপরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করেছিলো। নির্ভয়ে এবং সম্মানের সাথে কাজ করার পরিবেশ ছাত্রীদেরকে অধিকহারে ছাত্ররাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রতিবন্ধকতা

তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একজন নারীর মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। সামাজিকভাবে মেয়েদের উপর অনেক বাধা ছিল। ফলে সাধারণ ঘরের মেয়েরা আন্দোলন সংগ্রামে খুব একটা আসতে চাইতো না। মেয়েদের মিছিল মিটিংয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে রওশন জাহান সাথী বলেন, 'মেয়েরা দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় কাজ করবে, আন্দোলন করবে এটা তখন স্বাভাবিক কোন বিষয় ছিল না। ফলে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে বুঝাতাম, মেয়েদেরকে বুঝাতাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষকদের বুঝাতাম। কেউ বুঝতো, কেউ বুঝতো না। কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতাম।' (সাক্ষাৎকার : রওশন জাহান সাথী)। এভাবে নারীরা সামাজিক এবং পারিবারিক বাধা নিষেধের বেড়াজালে থেকে যারা বের হতে

পারতেন, তারাই আন্দোলন করতেন। অনেক মেয়ে তার বাবার চাকুরীর সমস্যা হবে মনে করে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনে অংশ নিতে পারতেন না।

উপসংহার

ধর্মীয়, পারিবারিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালের মধ্যেও এদেশের নারীরা স্বাধিকার আন্দোলনে, স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু ঢাকায় নয়, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, নারীদের এই জাগরণ ঢাকার কলেজ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের জেলা শহর—এমনকি থানা শহরেও জোয়ার সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকাসহ সর্বত্রই ছাত্রদের পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ-নারী প্রগতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা অধিকার আদায়ের প্রশ্নে বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফার মাধ্যমে এদেশের ছাত্রী সমাজ মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ক্রমান্বয়ে চলে আসা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের মূলোৎপাটনের লক্ষে ছাত্রীরা এসময় ছয় দফার মাধ্যমে সক্রিয় হয়।

ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতেগড়া ছাত্রসংগঠন, এই সংগঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এদেশের স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করতে চেয়েছিলেন। ছাত্রীদের উৎসাহের প্রধান কারণ ছিল ৬-দফার অন্তর্নিহিত মুক্তির বাণী যার মাধ্যমে বাঙালি তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। ছাত্রীদের সেই স্বপ্ন ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রাণবীজ হিসাবে কাজ করে। আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করি—একটি পতাকা লাভ করি।

তথ্যনির্দেশিকা :

অধ্যাপক মমতাজ বেগম ও মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১১৮।

অধ্যাপক মমতাজ বেগম, সাক্ষাৎকার, তৎকালীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল ছাত্রলীগ সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য। বর্তমানে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান, সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ০৫.০৯.২০১৮।

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০১২, পৃ.৩১০।

কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা প্রকাশন, ২০১০।

জি ডব্লিউ চৌধুরী, অনুবাদ: ইফতেখার আমিন, *দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৫।

ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৩।

ফরিদা খানম সাকী, সাক্ষাৎকার, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য। বর্তমানে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের যুগ্ম সম্পাদক এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সদস্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ০৮.০৯.২০১৮।

বাশার খান সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী ৫২ ও ৭১*, ডেইলি স্টার বুকস, ঢাকা, ২০১৮।

মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, অনুবাদ: জগলুল আলম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২।

মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ, উত্থানপর্ব, ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৬।

মাহমুদউল্লাহ সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*। গতিধারা, মার্চ ১৯৯৯।

রওশন জাহান সাথী, সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ০৪.০৯.২০১৮।

শাহনাজ পারভিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমী, জুন-২০০৭।

হাসান উজ্জামান, *আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।

[**Abstract:** Raising the issue of autonomy in East Pakistan, which was ruled and exploited by the West Pakistani regime, was a bold step in the history of Bangladesh's development and independence movement.

Autonomy movements and student contributions are intrinsically linked--no doubt, one complements the other. The student testifies to a broader concept, in that female students are self-aggrandizing in their performance status and perspective judgement.

Bangabandhu's demands for autonomy and 6-point formulation are recognized as milestones in the establishment of Bangladesh's independence movement and democracy.

The research work has been done to highlight the contribution of women students in those turbulent days of independence.

In this discussion based on published books, magazines and interviews, an attempt has been made to bring out many information and contributions of women students in the autonomy movement that are enlightened, undiscussed and neglected. Readers-critics-researchers from this work it will benefit even a little, I think.]